মেডেল

(গল্পগ্রন্থ – তালনবমী)

কয়েক বছর পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে; আমারই কোনোপ্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুন হয়তো চোখে ভুল দেখেথাকব বা ওই রকম কিছু।—কিন্তু আমার মন বলে, তা নয়, ঘটনাটা মিথ্যে ও অবাস্তব বলেউড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। আমার তখনকারের অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যাভাবচি, তাই মিথ্যে।

ঘটনাটি খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই একথা বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনো রোগ-বালাই নেই। আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে সময়ের কথা বলচি, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। আমার স্কুলমাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য ধরনের কখনো কিছু দেখিনি। অন্য পাঁচজন স্কুলমাস্টারের মতোই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন-বাঁধা কর্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহুবৎসর।

সে বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটিছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কি একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টাকরচে, আমার চোখে পড়ল। আমি ওদের দুজনকে অমনোযোগিতার জন্যে ধমক দিতে, অন্যএকটি ছেলে বলে উঠল, "স্যার, কামিখ্যে সুধীরের মেডেল কেড়ে নিচ্ছে..."

"কার মেডেল? কিসের মেডেল ?"

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার মেডেল, স্যার!"

অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বললুম, "ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিখ্যে ?

কামিখ্যে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে, "নিচ্ছিলুম না স্যার, দেখতেচাইছিলুম; তা ও দেবে না..."

"ওর মেডেল যদি ও না দেয়, তোমার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে? বোসো, ওরকম আর করবে না..."

কথা শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ওসখ্য থাকার ঔচিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পরে ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গেজিজ্ঞেস করলুম, "কই, কি মেডেল দেখি! কোথায় পেলে মডেল ?"

ভেবেছিলুম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে সব ব্যাডমিন্টন খেলা, সাঁতারের বাদৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারই কোনো কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থ স্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্যলাভ করে ছোট্ট এতটুকুএকটা আধুলির মতো মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচজনকে গর্বভরে দেখাতে চাইবে; এমন কি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাসসুদ্ধ হেডমাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়েএকবেলার জন্যে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছুল, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাত পেতে নিলুম; কিন্তু মেডেলটার দিকে একবার চেয়েদেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম। না, এ তো পাড়ার ব্যাডমিন্টন ক্লাবের বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরনো, বড় ও ভারি চমৎকার গড়ন!—কি জিনিস দেখি?

মেডেলের গায়ে কি লেখা রয়েচে, আধো-অন্ধকার ক্লাসরুমে ভাল পড়তে পারলুমনা—ও-পিঠ উল্টে দেখি, মহারানি ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্তি খোদাই করা। পকেটে চশমা নেই, মনে হল অফিসঘরের টেবিলে ফেলে এসেচি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করেছেআমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে। তাদের ধমক দিয়ে বললুম, "যাও, বোসোগে সব, ভিড় কোরো না এখানে।"

একটা ছেলেকে বললুম, "কি লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড়ো তো?"

ক্লাস ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে, "ক্রাইমিয়া, সিবাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া, রেজিনা...।"

"ও পিঠে?"

"সার্জেন্ট এ, বি. পার্কিন্‌স, সিক্সথ ড্রাগন গার্ডস—আঠারো শ' চুয়ান্ন সাল..."

দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় সিবাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে কোনো সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলন্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্রাগন গার্ডস সৈন্যদলের সার্জেন্ট পার্কিনসকে। এ তো সাধারণ জিনিস মোটেই নয়!

ক্রাইমিয়া...সিবাস্টোপোল! ...চার্জ অফ্ দি লাইট ব্রিগেড! কিন্তু কলকাতায় নীলমণিদাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে মেডেল কোথা থেকে আসে?

"এদিকে এসো, এ মেডেল কোথায় পেয়েছ?"

"ওটা আমার স্যার।"

"তোমার তা বুঝলুম, পেলে কোথায়?"

"আমার দাদু দিয়েছেন স্যার।"

"তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো?"

"হ্যাঁ স্যার, জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাহেব জমা রেখে গিয়েছিল।"

"কি ভাবে?"

"আমাদের মদের দোকান ছিল কিনা স্যার, মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখেগিয়েছিল, আর নিয়ে যায়নি—দাদুর মুখে শুনেছি।"

হিসেব করে দেখলুম ছিয়াশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে সেই বছরটি থেকে, যে বছরেসার্জেন্ট পার্কিনস্ (সে যেই হোক) এ মেডেল পায়। তখন তার বয়স যদি কুড়ি বছরও থেকেথাকে, এখন তার বয়স হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোনকালে!

সেদিন ছিল শনিবার, সকাল সকাল ছুটি স্কুল ছুটি হবে এবং অনেক দিন পরে সেদিনদেশে যাব পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলুম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়েনাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলুম, তাকে মেডেলটা দেখালেখুশি হবেন খুব। সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলুম, সোমবারে ফেরত দোব বললুম। স্কুলের ছুটির পরে বাসা থেকে সুটকেস নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে আড়াইটের গাড়ি ধরলুম। দেশের স্টেশনে যখন নামলুম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। দু'মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই হয়তো পৌঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটিনি।

ভাদ্র মাসের শেষ, অথচ বৃষ্টি তত বেশি না হওয়ায় পথ-ঘাট বেশ শুকনো খটখটে।পথের ধারের বর্ষা-শ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভাল লাগছিল অনেক দিন কলকাতা বাসের পরে—তাই জোরে পা না চালিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলুম। এখানে প্রথমেই বলি, আমার বাড়িতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর। আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন, অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে, পিসিমার মুখে শুনলুম, আজ দিন পনেরো হল বৃন্দাবন বাড়ি এসেচে। শুনে বড় আনন্দ হল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গেদেখা করব ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হলুম—যাবার সময় সুটকেসটা খুলেমেডেলটা পকেটে নিলুম, বৃন্দাবনকেও দেখাব।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুন নদীর জল ভয়ানক বেড়েছে, নদীর জল কূলছাপিয়ে দু'ধারের মাঠে পড়েছে। অনেকক্ষণ বসে রইলুম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামল একটু একটু, বাদুড়ের দল বাসায় ফিরছে। কেউ

কোনো দিকে নেই।—এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর পাড়ভেঙে গিয়েছে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরস্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতেএকবার কি-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত দেখচি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা অদ্ভুতইচ্ছা জেগে উঠল—আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়ব!...দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটাযেন ক্রমে বেড়ে উঠচে...লাফাই...দিই লাফ...! অথচ বর্ষার খরস্রোতা নদী, কুটো ফেললেদু'খানা হয়ে যায়! আমি সাঁতার জানি না,—গভীর জল পাড়ের নিচেই। ইচ্ছাটা কিছুতেই যেনসামলাতে পারচিনে। এমন কি আমার মনে হল, আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাকে লাফ দিতেইহবে, নইলে আমার জীবনের সুখ চলে যাবে!...

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে এক রকম জোর করেই চলে এলুম। কারণ যেন মনেহচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশ সীসের মতো ভারি হয়ে উঠছে—এর পর ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলেযাবে আমার!...

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি আসবার পথে ও-সব ইচ্ছে আর কিছু নেই। আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম—কি অদ্ভুত! এ রকম হওয়ার মানে কি? ট্রেনে বসে অতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়ল। এই ভাদ্র মাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিকহয়নি, তার ওপর বাড়ি এসে দু'তিন পেয়ালা চা খেয়েচি। এ সবেই ওরকমটা হয়েথাকবে।—নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ি গেলুম। বৃন্দাবনকে অনেক দিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হ'ল। দু'জনেঅনেক রাত পর্যন্ত বসে অনেক গল্প করলুম। অনেক-বছর-ধরে-জমানো অনেক সুখ-দুঃখেরকাহিনী। বড় গরম আজ, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্রমাসের গুমোট গরম। বৃন্দাবন বললে, "চল্ ভাই, ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে।..তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েছেন। তোদের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েচে।"

দু'জনে ছাদে উঠলুম। বাড়িটা দো-তলা। দো-তলায় ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতুম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন। দোতলার ছাদে উঠেদেখলুম—বাড়ির পেছন দিকটায় বাঁশের ভারা বাঁধা। বললুম, "বাড়িতে রাজমিস্ত্রি খাটচে বুঝি, বৃন্দাবন ?"

"হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে; উত্তর দিকের দেওয়ালটার গা থেকে নোনা ধরাইটগুলো বার করা হচ্ছে।"

বৃন্দাবন দোতলার ঘরটার মধ্যে ঢুকল—আমার কিন্তু মনে কেমন একটা অস্থির ভাব।খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল খেতে চাইলুম। বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম। ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা। ...যে দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করচে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ আমার মনে হল—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন!

বেশ হবে...লাফ দেব? প্রায় দুর্দমনীয় ইচ্ছা হল লাফ দেবার। লাফ দেওয়াই ভাল!... লাফ দিতেই হবে!..দিই লাফ?...এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে, "আয় ঘরেরমধ্যে, মা চা পাঠিয়ে দিচ্ছেন; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

আরো প্রায় আধ ঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও খাবার এসে পৌঁছুল। আমরাদুই বন্ধুতে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করলুম। তার পর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড়হল দেখতে নিচে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার বেড়াতে লাগলুম।রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল—লাফ এবার দিতেই হবে! কেউনেই ছাদে, কেউ বাধা দিতে আসবে না—এই উপযুক্ত অবসর। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনেরগভীর তলায় কে যেন বলছে-'লাফ দিয়ো না, মূর্খ! লাফ দিয়ো না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। ...আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করচে।...

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসের থেকে কি হল তাও জানিনে,—হঠাৎ বৃন্দাবনেরচিৎকারে আমার চমক ভাঙল। দেখি, বৃন্দাবন আমকে হাত ধরে টেনে তুলচে।

"একি সর্বনাশ! তুই লাফ দিয়ে পড়লি দেখলুম যেন! ভাগ্যিস্ বাঁশে পা বেঁধেগিয়েছে তাই রক্ষে...কি হ'ল তোর?"

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল, গা ঝিমঝিম করছিল। বৃন্দাবনকে বললুম, 'আমি ভাই কিছুই জানিনে তো!..."

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে। সকলে বললে ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে শরীর কি রকম খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ে আমি যাইনি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলুম—তবে ঠিক যে সময়টাতে আমি লাফ দিয়েছি সে সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কি একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকল। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—সুধীরের সেই মেডেলটা!

আশ্চর্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। বৃন্দাবনকে সেটা দেখালুম। ওদের বাড়ির সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্তিরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আমার বাড়িতে কেউ নেই বর্তমানে, একাইথাকি এক ঘরে। একটা জিনিস লক্ষ্য করচি, যখন থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েছি, তখন থেকেই কেমন এক ধরনের ভয় করছে আমার। বাড়িতে যখন ঢুকলুম, তখন ভয়টা যেন বাড়ল। একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েচি—এমন ভয় হয়নি মনে কোনো দিন।...না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে মনও দুর্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানলা—জানলা দিয়েবাড়ির পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে—কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর জ্যোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানলা খুলে রেখেচি। কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানিনে, ঘণ্টাখানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হতে লাগল আমার শিয়রেরদিকের জানলায় কে দাঁড়িয়ে! যেন মাথা তুলে সে দিকে চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে!কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হল। অথচ কিসের যে ভয় জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানলার দিকে তাকাতে পারলুম না। চোখে না দেখলেও আমার বেশ মনে হল, জানলার গরাদেতে দুটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে— জ্বলন্ত চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাব!

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম,—কিছুতেই চাইব না। ঘুমুবার চেষ্টা করলুম,—কিন্তুঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে? কিসের পচা গন্ধ? যেন আয়োডিন, লিন্ট, মলম প্রভৃতিউগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো। এতকাল বাড়িতে থাকা নেই, যার ওপর বাড়ি-ঘরপরিষ্কার রাখার ভার, সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল।...

কে যেন আমার মনের ভেতর বলছে, "চেয়ে দেখ, তোমার মাথার শিয়রের জানলারদিকে চেয়ে দেখ না!"

ঘরের চারিধারে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্তধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত ! সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—এমন কি সে দোরের চৌকাঠ পারকরে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিমশীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে।...

...আমি চাইব না...কিছুতেই চাইব না শিয়রের জানলার দিকে।

কিন্তু যে প্রভাবই হোক, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ-পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা বাস্তু শালগ্রামের অর্চনা করেছেন এ ঘরে...এর মধ্যে কারো কিছুখাটবে না। আমার মনই আবার এ কথাগুলি যেন বললে। অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে মন কতকথা কয় !

জানলার ধারে কি যেন একটা শব্দ হল।

অদ্ভুত ধরনের শব্দটা! কে যেন জানলার গরাদের ওপর ঠোকা দিয়ে আমার দৃষ্টিআকর্ষণ করতে চাইচে।...একবার..দু'বার, তিনবার...ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগল..কাউকে ডাকব চিৎকার করে?...একবার চেয়ে দেখব জানলার দিকে জিনিসটা কি? হঠাৎ আমার মনে পড়ল একটা ধাড়ি বেজী অনেকদিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে...আজ বিকেলেও সেটাকে একবার দেখেচি। জানলার ওপরকার কাঠে সেটাপোকামাকড় বা জোনাকি ধরছে..এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হতেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এল।...উঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন!..শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ! পাশ ফিরে এবার ঘুমুবার চেষ্টা করলুম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এ ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। এধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নই—আরো কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেচে—আমায় সেনিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না আজ।..

বারবার ঘুম আসে, আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি; কিন্তু চোখ চাইতে বাবিছানার ওপর উঠে বসতে সাহস হয় না...আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানলার গরাদেরওপর হতে শুনি—খুব মৃদু করাঘাতের শব্দ যেন।...যেন শব্দটা বলচে—"চেয়ে দেখ...পেছন ফিরে জানলার দিকে চেয়ে দেখ..."

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েছে, ভাদ্রের গুমোট গরম কিনা। এই অবস্থায় ভোর হল। দিনের আলো ফুটলে, লোকজনের শব্দ কানে যেতে রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে। নিশ্চিন্ত মনে বেলা ন'টা পর্যন্ত পড়ে ঘুম দিলুম। তার পর উঠে চা খেয়ে পাড়ায়বেড়াতে বার হওয়া গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল—তখন আমি তার বিশেষ কোনো মূল্য দিইনি—কিন্তু পরেসব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারি আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল। ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা, তাঁকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম—কিন্তু বৃন্দাবনদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখাকরতে পারিনি...

আমায় দেখে তিনি বললেন, "এই যে সুরেন, ভাল আছ ? কাল তুমি এসেচ দেখলুম, তখন অনেক রাত, তা আর ডাকলুম না। বোধ হয় বৃন্দাবনের বাড়ি থেকে ফিরছিলে, আমিতখন ছাদে পায়চারি করচি, যে গরম গিয়েছে বাবা কাল রাত্তিরে...তোমার সঙ্গে লোক রয়েছেদেখে আরো ডাকলুম না। ও লোকটি কে? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবীর মতো লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি ? বাঙালির মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ!"।

আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললুম, "আমার সঙ্গে লম্বা লোককাল রাত্তিরে! সে কি জ্যাঠামশায়!"

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে লোক ছিল না বলচো? একা যাচ্ছিলে? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা..."

আমি হেসে বললুম, "তাই হবে, জ্যাঠামশায়। চোখে কি রকম ঝাপসা দেখে থাকবেন।বয়েস হয়েচে তো...আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, তা ছাড়া আপনাদের বাড়ির সামনের আমগাছটার ছায়া...কি রকম আলো-আঁধার দেখেচেন চোখে...অমন ভুল হয়।"

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, কি আশ্চর্য কাণ্ড ! এতটা ভুল হবে চোখে! আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলুম তুমি আর তোমারপেছনে একজন লম্বা মতো

লোক...তার পর তুমি টর্চ নিবিয়ে আমগাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখনো জ্যোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে পেলুম লোকটিতোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে...তোমার মাথার চেয়েও যেন এক হাত লম্বা...তোমার একবারেঠিক পেছনে...তবে খুব ভাল তো দেখতে পেলুম না...অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারেরমধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো! এমন কি একবার এ পর্যন্ত মনে হল, তোমায় ডেকে জিগ্যেস করি তোমার বন্ধুটি কে?...একেবারে এত ভুল হবে চোখের!"

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললুম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলুম, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারের অন্য কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটানো গেল। গতকাল রাত্রের ভয়ের ব্যাপারদিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের কাছেই মনে হল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটাবলিওনি।

রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরব। বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে চা খেয়ে বাড়ি এসে সুটকেসটানিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছি, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নেমেছে। বাউরিপাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে আসচি...বাগানটা পার হতে প্রায় পাঁচ-ছ' মিনিট লাগে—মস্ত বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝামাঝি এসে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইলুম কি ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমারসারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচমকা ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেল।

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে ?

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধ-অন্ধকারে এক অদ্ভুত মূর্তি। খুবলম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরনের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়েথুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে ধরনের টুপি দেখা যায়।... মূর্তিটাযেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে, আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে। মরিয়ার মতো আর একটু এগিয়ে গেলুম। এই ভয়ানক কৌতূহল আমাকেচরিতার্থ করতেই হবে যেন। মূর্তি নড়ে না চড়ে না,—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি। কিন্তু বেশস্পষ্ট দেখচি সাত আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্তিটা। আর ঘোড়ার বালামচির লম্বা টুপি ওইস্পাতের চেনের স্ট্র্যাপ দেখতে পেলুম।

আমার পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসছে, মাথাটা হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েচে। বোধ হয় আর আধ মিনিট এ-ভাবে থাকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতুম—কারণ সেই ভীষণ মূর্তিটার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে আমার পা দুটো বেজায় ভারীহয়েচে—নড়বার উপায় নেই মূর্তির সামনে থেকে...

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাউরিবাগানের পথে লণ্ঠন নিয়ে কারা ঢুকল। দু-তিনজন লোকেরগলার শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এল। আমি ওদের ডাক দিলুম চিৎকার করে। ওরা ছুটেএল। আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললে, "ওখানে কি বাবু? কিহয়েচে?"

তারপর লণ্ঠন তুলে ওরা আমার মুখ দেখে বললে, "ও, আপনি! কি হয়েচে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েচে—ভয়টয় পেলেন নাকি? বাউরিবাগান জায়গাটাভাল না। সন্ধের পর এখানে অনেকে ভয় পায়।"

ওদের লণ্ঠনটা যখন উঁচু করে তুলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলুম—সামনের মূর্তিটা তখনো সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে। একজন বললে, "কি দেখছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই ষাঁড়াগাছটা?"

আর একজন বললে, "গাছটার ডালপালা কেটে মাথায় ঝোপের মতো করে রেখেচে, যেন মানুষ বলে অন্ধকারে ভুল হয় বটে...চলে আসুন বাবু!"

আমিও দেখলুম ষাঁড়াগাছই বটে। মাথার দিকে পাতাগুলোছেঁটে গাছটাকে দেখতেহয়েছে ঠিক হর্সগার্ডসদের ঘোড়ার বালামচির টুপি। লোকের চোখের কি ভুলই হয়! কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলুম! ভেবে লজ্জা হল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হতেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা!

ওরা আমায় আলো ধরে স্টেশনে পৌঁছে দিলে।

পরের দিন স্কুলে সুধীরের মেডেলটা ফেরত দিলুম।

সুধীর বলল, "আপনাকে দাদু একবার ডেকেচেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়িআসুন, নিয়ে যেতে বলেচেন।"

সুধীরের দাদু বললেন, "যাক, আমার বড় ভয় হয়েছিল, মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েচেন দেশে শুনলুম কিনা, আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তাহলে একটা তার করে দিতুম। ...ও মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়েযায়—আমি তখন জন্মাইনি। বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারেনি। বেজায় মাতাল আর গোঁয়ার ছিল লোকটা। ও মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে। আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুনলে না—অনেক কালআগের কথা—বাড়ি নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে; সেই দিনই সন্ধের সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুল।..."

আমি কলের পুতুলের মতো শুধু বললুম, "ছাদ থেকে!...পকেটে মেডেল পাওয়াগেল!.."

"হ্যাঁ, মাস্টারবাবু। আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথাতো বলবে না! আজ সাতাশআটাশ বছর আগের কথা।...ওটা আরো দু-একজন নিয়েছে—তক্ষুনি ফেরত দিয়ে গিয়েচে। বলেরাত্রে ভয় পায়, গা ছমছম করে। কে যেন পেছনে ফলো করছে বলে মনে হয়। ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না—প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়।...তাই ভাবছিলুম একটা তার করে দেব.."

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে যাই। বাউরিবাগানে ঢুকেযেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলুম, সেদিকে চেয়ে দেখে সে ষাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখেপড়ল না। যে আমগাছটার ধারে ষাঁড়াগাছটা দেখেছিলুম, সেখানে দিনমানে বেশ ভাল করে দেখেছি—কোথাও সে ষাঁড়াগাছ নেই—বা গাছ কেটে নিলে যে গুঁড়িটা থাকবে, তারও কোনো চিহ্ন নেই। কস্মিনকালে সেখানে একটা বড় ষাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না জায়গাটাদেখে।...